যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ২৩ × বুধবার, ১৭ এপ্রিল ২০১৯

পথঘাট ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা নিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতামত

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন সমস্যাসমূহ

বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

পথঘাট ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা নিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতামত

উৎস: ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত ইন্টারনিউজ প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ দল কোবো কালেক্ট অ্যাপ ব্যবহার করে ১পুঃ, ১পঃ, ২পুঃ, ২পঃ, ৩, ৪ ও ৪-এক্সটেনশন ক্যাম্প থেকে মতামত সংগ্রহ করেছেন। ইংরেজি ও বাংলা লিপি ব্যবহার করে রোহিঙ্গা ভাষাতে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। মোট ২৫৮টি প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে যে সব প্রধান প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে– অপ্রতুল সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ক্যাম্পের মধ্যে অবাধ চলাচলে বাধা এবং পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা মেরামত না হওয়ার কারণে সৃষ্ট স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা। পথঘাট এবং পয়ঃপ্রণালী সমস্যা সংক্রান্ত মোট ৪০টি উদ্বেগ রিপোর্ট করা হয়েছে।

ইন্টারনিউজ

ফেব্রুয়ারি ১৬ – মার্চ ২, ২০১৯

মোট মতামত		
২৫৮	১৭১	৮৭

আসন্ন গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে, ক্যাম্পের অভ্যন্তরে পথঘাট ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার নানা সমস্যা নিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনেক সদস্য তাদের দুশ্চিন্তার কথা ব্যক্ত করেছেন। এই সমস্যাগুলো আরো বাড়বে আশঙ্কা করে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তারা মনে করেন যে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত জটিলতা রোধ করতে আশু ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। তাদের উদ্বেগগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- ঘর থেকে ব্লকে যাওয়ার ভালো পথ না থাকা এবং একইভাবে ব্লক থেকে প্রধান সড়কে যাওয়ার ভালো রাস্তা না থাকা।
- সঙ্কীর্ণ, ঢালু ও ভাঙাচোরা রাস্তা
- পাহাড়ের উপর পর্যন্ত কোনো সিঁড়ি নির্মাণ করা হয় নি, যার ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে এবং পানি ও অন্যান্য সামগ্রী আনার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়
- নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বিশেষ করে বয়স্ক ও শিশুরা বর্তমান পথঘাট ব্যবহার করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় আহত হচ্ছেন
- ড্রেন ও ডাস্টবিনের কাছে থাকা বাড়িগুলো দুর্গন্ধ, দূষণ ও বন্যার কারণে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে
- অনেক ব্লকের ড্রেন ও ডাস্টবিন পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে

মতামত প্রদানকারী রোহিঙ্গা জনগণ এক ব্লক থেকে অন্য ব্লকে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত সড়ক, রাস্তা ও সিঁড়ির অভাবে সৃষ্ট সমস্যাগুলো নিয়ে তাদের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমান অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতার কারণে বর্ষাকালে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের সময় তারা দারুণ ভাবে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবেন। অনেক নারী হতাশা প্রকাশ করেছেন যে, খারাপ রাস্তা ও সিঁড়ির কারণে পানি আনার মতো অপরিহার্য কাজও অনেক কষ্টসাধ্য এবং মাঝে মাঝে বিপদজনক হয়ে ওঠে। অনেক ব্লকে, পাহাড়ের পাদদেশে যেখানে পানির কূয়া ও ল্যাট্রিন অবস্থিত, সেখান থেকে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত ভালো সিঁড়ি নেই। অনেক জায়গায়, পাহাড়ের ধার ঘেসে মাটি কেটে সরু পথ তৈরি করা হয়েছে, এই পথ অত্যন্ত খাড়া এবং এর নিচের মাটি যে কোনো সময় ধ্বসে যেতে পারে। জনগোষ্ঠীর লোকদের ধারণা দৈনন্দিন কাজকর্ম, যেমন পানি ভর্তি কন্টেইনার বা খাবারের বড় বস্তা নিয়ে এই সব রাস্তায় যাতায়াত বর্ষাকালে আরো কঠিন হয়ে উঠবে। অধিবাসীদের আশঙ্কা যে, একারণে তারা পর্যাপ্ত পানি সংগ্রহ করতে পারবেন না।

> “আমাদের ব্লকের রাস্তা ভাল না। ... আমাদের ব্লকের ১৮০টি বাড়ির প্রতিটিই পাহাড়ের ধারে। ... আমাদের পাহাড়ের নিচ থেকে পানি নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠতে হয়। আমরা যে রাস্তা ব্যবহার করি তাতে কোন সিঁড়ি নেই। এছাড়া রাস্তাটি ছোট ও সংকীর্ণ। পানি ভরা পাত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে পাহাড় থেকে নামতে আমাদের অনেক সমস্যা হয়। আসন্ন বর্ষাকাল আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হবে।”
>
> – নারী, ৫২, ক্যাম্প ২ পশ্চিম

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনেকেই জানিয়েছেন যে তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন, কেননা অনেকেই পাহাড়ি রাস্তায় ওঠানামার সময় পড়ে গিয়েছেন ও আহত হয়েছেন। সকলে ধারণা করছেন যে, পাহাড়ের পাদদেশের ঘরবাড়ি ও রাস্তা বন্যায় প্লাবিত হবে। যাদের ঘরবাড়ির সাথে রাস্তার সরাসরি সংযোগ নেই তারা এই নিয়ে চিন্তিত যে, আসন্ন গ্রীষ্মকালীন উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় তারা সহজে খাবার ও পানীয় সংগ্রহ করতে পারবেন না। বিশেষ করে বৃদ্ধ ও শিশুদের জন্য খাড়া পাহাড়ি রাস্তা ব্যবহার করা কঠিন। মতামতের অর্ধেকেরও বেশি সংগৃহীত হয়েছে বয়স্ক উত্তরদাতাদের কাছ থেকে, তারা জানিয়েছেন যে খারাপ রাস্তাঘাট ও ড্রেনের কারণে তারা নানাবিধ সমস্যায় পড়ছেন। বেশ কয়েকজন বয়স্ক উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের রাতের অন্ধকারে খাড়া পথ বেয়ে ফিরতে হবে বলে তারা রাতে মসজিদে যেতে পারেন না। মা-বাবারাও তাদের সন্তানদের নিয়ে একই উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন, কারণ এই রাস্তাগুলো দিয়ে তারা স্কুলে বা মসজিদে যায়।

> “আমাদের ছোট ছোট শিশুগুলো এই রাস্তা দিয়ে ওঠানামার সময় পড়ে যায়। বয়স্ক লোকেরাও রাস্তায় ওঠানামার ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়ছেন। বৃদ্ধরা রাতে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যেতে পারেন না। এই রাস্তা ধরে মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের পড়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে, একারণে তারা ঘরেই নামাজ পড়েন।”
>
> – নারী, ৫২, ক্যাম্প ২ পশ্চিম

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বর্জ্য নিষ্কাশন একটি প্রধান সমস্যা। মতামতের ষাট শতাংশই ড্রেন ব্যবস্থা ও বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা সংক্রান্ত। ১৮ মাস পরেও, অনেক ব্লকের অধিবাসীরা জানিয়েছেন যে তাদের ড্রেন বা ডাস্টবিনগুলো পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে। কিছু কিছু ব্লকে, বাঁশ দিয়ে কিছু ড্রেন তৈরি করা হয়েছিল, এ বাঁশগুলো বদলে না দেয়া ও আনুষঙ্গিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অকেজো হয়ে পড়েছে। এর ফলে বর্জ্য পদার্থ উপরিভাগে জমা হচ্ছে। অনেক উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে ড্রেনের পানি আবার তাদের ঘরে ফিরে আসে এবং দূষণ ঘটায়। দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে মতামত সংগ্রহ কালে, রোহিঙ্গা মানুষেরা অসংখ্যবার উল্লেখ করেছেন যে ড্রেনগুলো বন্ধ হয়ে রয়েছে এবং ক্যাম্পে বেশ কিছু রোগের প্রকোপ বেড়েছে। যাদের বাড়িতে দূষিত পানি ফিরে আসে, তাদের অধিকাংশেরই ত্বকের সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্য সমস্যার পাশাপাশি, বন্ধ হয়ে যাওয়া ড্রেনগুলো দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং অনেকেই এই বন্ধ ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলায় আরো উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ড্রেনের কাছাকাছি বসবাসকারীরা বলেছেন যে, ড্রেনে সব ধরনের ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়, ফলে ড্রেনগুলো আরো বন্ধ হয়ে পড়েছে। তারা আরো বলেন যে, এই ড্রেনগুলোতে ক্রমাগত আবর্জনা ফেলার কারণে মারাত্মক বায়ুদূষণ হচ্ছে এবং মাঝে মাঝে জলাবদ্ধতাও সৃষ্টি করছে।

> “পাহাড়ের পাশে আমাদের ব্লকে একটি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছিল। উপরের ঘরগুলোতে যারা থাকেন তারাও ড্রেনে আবর্জনা ফেলেন আবার আমাদের নিচে যারা আছেন তারাও ড্রেনগুলোতে আবর্জনা ফেলেন, ফলে ড্রেন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে এখন দুর্গন্ধ ছড়ায়।... আমরা ঘরের ভিতর টিকতে পারি না। এই দুর্গন্ধের কারণে আমরা নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়েছি। আমরা মনে করি যদি আমাদের ব্লকের ড্রেনটি পরিষ্কার করা হয় তাহলে খুবই ভালো হবে এবং আমাদের রোগবালাই হবে না।”
>
> – পুরুষ, ৬৩, ক্যাম্প ১ পূর্ব

> “আমাদের ব্লকে আমাদের অনেক সমস্যা আছে, কারণ আমাদের ময়লা-আবর্জনা ফেলার কোনো জায়গা নেই। আমাদের কোনো ডাস্টবিনও নেই। অন্যান্য ব্লকে আবর্জনা ফেলার জন্য বালতি দেয়া হয়, এবং সেখানে স্বেচ্ছাসেবকেরাও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালায়। ... কোনো এনজিও যদি আমাদের ব্লকে ময়লা ফেলার জন্য ঝুড়ি দেয় এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা যদি এখানে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালায় তাহলে খুবই ভালো হয়।”
>
> – নারী, ৫০, ক্যাম্প ১ পূর্ব

রোহিঙ্গা জনগণ একে অপরের সাথে রাস্তাঘাট ও বর্জ্য নিষ্কাশন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য বিভিন্ন কৌশল বিনিময় করেন। যেহেতু গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল আসছে, তাই যে কোনো অবকাঠামোগত কাজ অসম্ভব হয়ে পড়ার আগেই, তারা এখনই এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি জোর দেন। যারা উত্তর দিয়েছেন তারা অনুরোধ করেছেন, যেন পাহাড়ি রাস্তায় কংক্রিটের সিঁড়ি নির্মাণ করা হয় এবং যে সব জায়গায় সম্ভব সেখানে রাস্তা আরো চওড়া করা হয় যাতে মালামাল নিয়ে আরো সহজে ও নিরাপদে যাতায়াত করা যায়। বর্জ্য অপসারণ সমস্যা সমাধানের জন্য তারা বন্ধ হয়ে যাওয়া ড্রেনগুলো পরিষ্কার করার কথা বলেছেন যাতে তরল বর্জ্য সঠিকভাবে অপসারিত হয় ও আর কোনো ভোগান্তি সৃষ্টি না হয়। যে সব ব্লকে ডাস্টবিন নেই, সেইসব ব্লকে তারা অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ ফেলার জন্য ডাস্টবিন বা ময়লার ঝুড়ি চেয়েছেন।

আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন সমস্যাসমূহ

উৎস: বেতারের আলোচনা অনুষ্ঠান 'বেতার সংলাপে' অংশগ্রহণকারী আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর শ্রোতাদের মতামত। অনুষ্ঠানটি ১৩রা মার্চ ২০১৯ তারিখে কক্সবাজারে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে রেকর্ড করা হয়। অনুষ্ঠান চলাকালে শ্রোতাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন থেকে এই সমস্যাগুলো নথিবদ্ধ করা হয়েছে। বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ইউনিসেফের সহায়তায় বাংলাদেশ বেতার এই অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছে। মোট ৩৬ জন শ্রোতা প্রশ্ন করেন, যার মধ্যে ৭৫% ছিলেন পুরুষ এবং ২৫% ছিলেন নারী। তাছাড়া, এই সমস্যাগুলো সৃষ্টির পেছনের কারণ আরো ভালোভাবে বুঝতে আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীতে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন বা দলগত আলোচনা আয়োজন করা হয়।

কক্সবাজারে বসবাসকারী আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠী মনে করেন যে, রোহিঙ্গা সংকটের ফলে তাদের জীবনে বহুবিধ প্রভাব পড়েছে। তারা মনে করেন যে, রোহিঙ্গা জনগণের জন্যই তারা নিজেদের এলাকায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন না। তাছাড়াও, তাদের অনেকেই মনে করেন যে তাদের জীবিকা নিয়েও তাদের সমস্যা হচ্ছে যেহেতু রোহিঙ্গা মানুষেরা তাদের কাজ নিয়ে নিচ্ছেন। স্বাস্থ্য সেবার ক্রমবর্ধমান খরচ এবং এ অঞ্চলে পর্যটন শিল্পের প্রসার কমে যাওয়া বিষয়েও তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও, রোহিঙ্গা সংকটের শুরু থেকেই পৌরসভা অফিস জন্ম সনদ প্রদান বন্ধ করে দেয়ায়, আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠী জন্ম সনদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছেন।

আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠী জানিয়েছে যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর চলাফেরা নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব রোড ব্লক দেয়া হয়েছে, তা আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর স্বাধীন যাতায়াতে ও বাধার সৃষ্টি করছে। আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর চলাচল আরো ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য কী করা যেতে পারে। এতে তারা ক্যাম্পের চেকপোস্টে রোহিঙ্গা জনগণের আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখার কথা বলেন। তারা মনে করেন যে, এটা করলে রোড ব্লকের প্রয়োজন কমে যাবে এবং আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠী অবাধে চলাফেরা করতে পারবেন।

রোহিঙ্গা সংকটের শুরু থেকে আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকা প্রধানতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোহিঙ্গা সংকট শুরুর আগে, স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিরা নানাবিধ কাজ করতেন যেমন ধান ও শাকসবজি উৎপাদন, কাঠ ও বাঁশ কাটা, শাকসবজি, মাংস, ওষুধ এবং পোশাক বিক্রির দোকানে কাজ করা, দিনমজুরী এবং জ্বালানী সংগ্রহ ও বিক্রি। শিক্ষিত ব্যক্তিরা শিক্ষকতা, সরকারি চাকুরি, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং এনজিও কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। স্বল্পশিক্ষিত লোকেরা বলেছেন যে, রোহিঙ্গা সংকট শুরুর সময় থেকে তারা বিভিন্ন কারণে তাদের কাজ হারিয়েছেন। শিক্ষিত ব্যক্তিরা আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে তাদের চাকুরি ছেড়ে দিয়েছেন এবং রোহিঙ্গা সংকটে সহায়তা-প্রদানকারী এনজিওগুলোতে বিভিন্ন পদে কাজ করছেন, যেখানে তাদের বেতন অনেক বেশি। তারা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের জনগোষ্ঠী থেকে ৮০০ জন ব্যক্তি জেলা কমিশনারের কাছে কাজের জন্য আবেদন করেছিলেন, কিন্তু কত জন কাজ পেয়েছেন সে সম্পর্কে তাদের কোনো তথ্য দেয়া হয়নি।

এছাড়াও, স্থানীয় যেসমস্ত লোক দিনমজুর হিসেবে কাজ করেন তারা দৈনিক মজুরি কম পাচ্ছেন যেহেতু রোহিঙ্গা দিনমজুরেরা তাদের কাজগুলো করছেন এবং কম মজুরিতে কাজ করতেও তাদের আপত্তি নেই। শ্রোতামণ্ডলী ব্যাখ্যা করেন যে, স্থানীয়রা যেখানে প্রতিদিন ৪০০-৫০০ টাকা দাবি করেন সেখানে রোহিঙ্গা দিনমজুরেরা একই কাজ ২০০-৩০০ টাকায় করতে রাজি, কারণ

তাদের প্রাথমিক চাহিদা ত্রাণের সামগ্রীতে পূরণ হয়ে যাচ্ছে যা স্থানীয় লোকেরা পান না।

শ্রোতারা একথাও বলেছেন যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আসার ফলে স্থানীয় মুদি দোকানগুলোর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, যেমন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর লোকেরা এখন অনেক দোকানের মালিক। অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে রোহিঙ্গা জনগণ যেহেতু ত্রাণ পাচ্ছে সেহেতু আশ্রয়দাতা গোষ্ঠীর মতো তাদের টাকার খুব বেশি প্রয়োজন নেই, তাই তারা ত্রাণের সামগ্রী কম দামে স্থানীয় বাজারে বেচে দিচ্ছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আসার আগে দৈনিক আয় ৫,০০০ টাকা ছিল বলে কিছু কিছু মুদি দোকান মালিকরা জানিয়েছেন, যা এখন কমে ১,২০০ টাকায় নেমে এসেছে। এছাড়া, রোহিঙ্গা চালকেরা স্থানীয় চালকদের চেয়ে কম ভাড়ায় রিকশা, অটোরিকশা আর ভ্যান চালাচ্ছেন, যার ফলে আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর মাঝে বেকারত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে, তাদের আয় কমে অর্ধেক হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের দৈনন্দিন খরচ দ্বিগুণ বেড়েছে। যেমন, তাদের যদি আগে খাবার (চাল, মাছ, মাংস, শাকসবজি) কিনতে ৬৫০ টাকা লাগত, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আসার পর এখন সেই জায়গায় লাগছে ২০০০ টাকা। তারা আরো জানিয়েছেন যে চিকিৎসা, যাতায়াত আর শিক্ষার খরচও বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে।

অংশগ্রহণকারীরা দাবি জানিয়েছেন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে যেন অবিলম্বে তাদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়, কারণ তারা আশঙ্কা করছেন যে, রোহিঙ্গা গোষ্ঠীর জনসংখ্যা এরপর আরো বাড়বে, আর তার সাথে সাথে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাও বৃদ্ধি পাবে। তাদের ধারণা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠিয়ে দিলে তাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অন্যথায়, তাদের দুর্দশার শেষ হবে না।

রোহিঙ্গা পুনর্বাসন বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে সে সংক্রান্ত সাম্প্রতিক তথ্য তারা জানতে চান। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান হিসাবে তারা চায় যে, রোহিঙ্গা জনগণ তাদের এলাকায় আশ্রয় নেয়ায় ও কাজকর্ম করতে শুরু করায় যে প্রভাব পড়েছে তা দূর করতে সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্য করা উচিৎ। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, কেন্দ্রীয় প্রশাসন (এম.পি. এবং মন্ত্রিদের) এর কাছ থেকে নির্দেশ পেলেই কেবল এনজিও , স্থানীয় প্রশাসন এবং নির্বাচিত অফিসাররা তাদের এলাকা থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কাজকর্ম বন্ধ করে তাদেরকে উচ্ছেদ করতে পারেন।

> “রোহিঙ্গা জনগণকে তাদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য ত্রাণ দেয়া হয়, তাই তারা কম পারিশ্রমিকে কাজ করে, কিন্তু আমরা কোনো ত্রাণ পাই না। আমরা কীভাবে কম পারিশ্রমিকে কাজ করব?”
>
> – পুরুষ, ৪৮, আশ্রয়দাতা গোষ্ঠী, উখিয়া

> “আগে আমাদের চিকিৎসার জন্য বছরে ৫,০০০-৬,০০০ টাকা লাগত, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আসার পর এখন সেখানে ২০,০০০ টাকা লাগে।”
>
> – নারী, ৩৫, আশ্রয়দাতা গোষ্ঠী, উখিয়া

আশ্রয়দাতা গোষ্ঠীর সদস্যরা রোহিঙ্গা সংকটের পূর্বে ও পরে জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে তাদের দৈনন্দিন খরচ উল্লেখ করেছেন

মৌলিক চাহিদা	খরচের খাত	রোহিঙ্গা সংকটের আগের দাম	রোহিঙ্গা সংকট আরম্ভের পর দাম
ঘরবাড়ি	ইট	৫-৬ টাকা/প্রতিটি	৯-১০ টাকা/প্রতিটি
	রড	৬০,০০০ টাকা/টন	৬৭,০০০ টাকা/টন
	সিমেন্ট	৩০০ টাকা/বস্তা	৪৫০ টাকা/বস্তা
	কাঠ	৩০০-৪০০ টাকা/ফুট	৫০০-৬০০ টাকা/ফুট
	বাঁশ	৫০-১০০ টাকা/প্রতিটি	২৫০ টাকা/প্রতিটি
	টিন	৪,০০০ টাকা/বাণ্ডিল	৬,০০০ টাকা/বাণ্ডিল
শিক্ষা	স্কুলের বেতন	৩০০ টাকা/মাস	৬০০ টাকা/মাস
	প্রাইভেট টিউশনের বেতন	২০০-৫০০ টাকা/মাস	১,০০০ টাকা/মাস

মৌলিক চাহিদা	খরচের খাত	রোহিঙ্গা সংকটের আগের দাম	রোহিঙ্গা সংকট আরম্ভের পর দাম
চিকিৎসা	ডাক্তারের ফি	২০০-৩০০ টাকা/ভিজিট	৫০০-১,০০০ টাকা/ভিজিট
	বার্ষিক চিকিৎসা খরচ	৫,০০০-৬,০০০ টাকা/বছর	২০,০০০ টাকা/বছর
পরিবহন	রিকশা ভাড়া	৩০ টাকা/প্রতিবার	৬০ টাকা/প্রতিবার
	অটোরিকশা ভাড়া	৫ টাকা/প্রতিবার	২০ টাকা/প্রতিবার

মৌলিক চাহিদা	খরচের খাত	রোহিঙ্গা সংকটের আগের দাম	রোহিঙ্গা সংকট আরম্ভের পর দাম
খাবার	চাল	২৫-২৮ টাকা/কেজি	৩৬-৩৭ টাকা/কেজি
	মাছ	২০০ টাকা/কেজি	৪০০ টাকা/কেজি
	মাংস	৪০০ টাকা/কেজি	৬০০ টাকা/কেজি
	শাকসবজি	২০-৩০ টাকা/দিন	৫০-৬০ টাকা/দিন
জামাকাপড়	সালোয়ার কামিজ	৫০০ টাকা/প্রতিটি	১,০০০ টাকা/প্রতিটি
	শিশুদের জামাকাপড়	২০০ টাকা/প্রতিটি	৫০০ টাকা/প্রতিটি

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।